أحكام فقهية - بنغالي

ফিকহী মাসায়েল

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي
هاتف: ٠٦ ٤٢٣٤٤٦٦ فاكس: ٠٦ ٤٢٣٤٤٧٧
102

أحكام فقهية

أعده وترجمه للغة البنغالية

شعبة توعية الجاليات في الزلفي

الطبعة الثانية: ١٤٢٧/٨ هـ

ⓒ **شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤٢٦هـ**

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

شعبة توعية الجاليات بالزلفي

أحكام فقهية/ شعبة توعية الجاليات بالزلفي-١٤٢٤هـ

٤٦ ص؛ سم ١٢X ١٧

ردمك : ٣-٣٨- ٨٦٤-٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية)

١-العبادات (فقه إسلامي)

٢- الزواج (فقه إسلامي) أ-العنوان

ديوي ٢٥٢ ١٤٢٤/٥١٧٠

رقم الإيداع : ١٤٢٤/٥١٧٠

ردمك : ٣-٣٨-٨٦٤-٩٩٦٠

الصف والإخراج: شعبة توعية الجاليات في الزلفي

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়
৫	যাকাতের বিধান ও কিসে যাকাত ওয়াজিব হয়
৬	সোনা ও রূপায় যাকাত
৭	ব্যবসায় সমগ্রীতে যাকাত
৮	শরীকানায় যাকাত
৯	জমি থেকে উৎপন্ন ফসলে যাকাত
৯	চতুষ্পদ জন্তুর যাকাত
১০	উটের যাকাত
১৩	গরু ও মোষের যাকাত
১২	ছাগলের যাকাত
১৩	যাকাতের হকদার
১৬	খাদ্য সম্পর্কীয় বিধান
১৯	জবায়ের বিধান ও শর্তাবলী
২১	জবাই করার আদব
২১	শিকার করা
২৩	পোশাক-পরিচ্ছদের বিধান
২৭	পোশাকের ব্যাপারে বর্ণিত সুন্নাত ও আদব
৩১	বিবাহের শর্তাবলী
৩৩	বিবাহের পর যা আরোপিত হয়
৩৪	বিবাহের সুন্নাত ও আদব
৩৬	যে সমস্ত নারীদের বিবাহ করা হারাম
৪০	ত্বালাক্ব
৪১	ত্বালাকের পর যা আরোপিত হয়
৪২	খুলআ'
৪২	বিবাহে একে অপরের অধিকার
৪৩	অমুসলিমকে বিবাহ করা
৪৫	ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান নারীদের বিবাহ করার ক্ষতি

أحكام الزكاة
যাকাতের বিধান

যাকাত হলো ইসলামের রূকনসমূহের তৃতীয় রূকন। যে মুসলিম নেসাবের মালিক হয় এবং তাতে এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায়, তার উপর যাকাত ওয়াজিব হয়। আল্লাহতা'য়ালা বলেন,

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة ١١٠]

অর্থাৎ, "নামায কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর।" (সূরা বাক্বারাঃ ১১০) যাকাতের বিধান প্রণয়নের মধ্যে রয়েছে বহু লাভ ও উপকারিতা। যেমন,

১। আত্মাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করণ এবং কৃপণতার অভ্যাসকে তার থেকে দূরীকরণ।

২। দানশীলতার অভ্যাসে মুসলিমদের অভ্যস্ত করণ।

৩। ধনী ও গরীবের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপিত করণ। কারণ মানুষ তার অনুগ্রহকারীর প্রতি ভালবাসা পোষণ করে।

৪। অভাবী মুসলিমদের দেখা-শুনা করণ ও তাদের প্রয়োজন পূরণ করণ।

৫। মানুষকে পাপ থেকে পবিত্র করণও যাকাতের উপকারিতার অন্তর্ভুক্ত। কেননা, যাকাত প্রদানে পাপ মোচন হয় এবং মর্যাদা-সম্মান বৃদ্ধি পায়।

কিসে যাকাত ওয়াজিব হয়?

সোনা ও রূপা, ব্যবসা সামগ্রী, চতুষ্পদ জানোয়ার এবং জমি থেকে উৎপাদিত ফসলাদি ও খনিজদ্রব্যে যাকাত ওয়াজিব হয়।

সোনা ও রূপার যাকাত

সোনা ও রূপা যে প্রকারের হোক না কেন যখনই কেউ নেসাবের মালিক হবে, তখনই তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। সোনার নেসাব হলো, 'কুড়ি মিসকাল' অর্থাৎ, ৮৫ গ্রাম সমপরিমাণ। আর রূপার নেসাব হলো, '২০০ দিরহাম নববী' অর্থাৎ, ৫৯৫ গ্রাম সমপরিমাণ। যে ব্যক্তি সোনার অথবা উল্লিখিত নেসাবের মালিক হবে, তাকে শতকরা আড়াই ভাগ (২.৫ %) যাকাত আদায় করতে হবে। যদি কেউ প্রচলিত মুদ্রায় সোনার ও রূপার যাকাত আদায় করতে চায়, তাহলে তাকে এক বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার সময় এক গ্রাম সোনা ও রূপার দাম কত সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে হবে। অতঃপর সে তার দেশে প্রচলিত মুদ্রায় সেই সমপরিমাণ যাকাত আদায় করবে। এর উদাহরণ হলো,

মনে করুন, যদি কোন ব্যক্তি ১০০ গ্রাম সোনার মালিক হয়, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে, যদি এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। কেননা, সে নেসাবের মালিক হয়ে গেছে। আর তাতে যাকাত লাগবে ২,৫ গ্রাম। এবার যদি সে প্রচলিত মুদ্রায় যাকাত আদায় করতে চায়, তাহলে এক বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার সময় সোনার দাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে এবং সোনার দাম অনুযায়ী এক গ্রাম সোনার যে মূল্য দাঁড়ায় সেই মূল্য অনুপাতে ২,৫ গ্রাম সোনার যা মূল্য হবে তা প্রচলিত মুদ্রায় আদায় করবে। রূপার ক্ষেত্রেও অনুরূপ করবে।

অনুরূপ প্রচলিত মুদ্রাতেও যাকাত ওয়াজিব, যদি তা নেসাব পর্যন্ত **পৌঁছে এবং এক বছর অতিবাহিত হয়। সুতরাং যদি কেউ ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের মূল্যের মালিক হয়, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।** তাকে ২,৫ % সমপরিমাণ যাকাত আদায় করতে হবে। যে মুসলিমের

নিকট এক বছর পর্যন্ত গচ্ছিত কোন মাল থাকবে, সে সোনা বিক্রেতাকে ৮৫ গ্রাম সোনার মূল্য জিজ্ঞাসা করবে। অতঃপর তার মাল যদি সেই পরিমাণ হয়, তাহলে যাকাত আদায় করবে। কিন্তু যদি তার মাল সেই পরিমাণ না হয়, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। এর উদাহরণ নিম্নরূপ,

যদি কোন ব্যক্তির নিকট ৮০০ রিয়াল থাকে এবং তাতে এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে সে এক গ্রাম রূপার দাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, যদি তার দেশের মুদ্রার মূল্য রূপার উপর নির্ধারিত হয়, অতঃপর যদি দেখে ৫৯৫ গ্রাম রূপার দাম ৮৪০ রিয়াল সমপরিমাণ, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। কারণ তার নিকট যে মুদ্রা রয়েছে, তা নেসাব পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না। আর তা হলো, ৫৯৫ গ্রাম রূপা। সোনার ব্যাপারটাও অনুরূপ।

ব্যবসায় সামগ্রীতে যাকাত

টাকা-পয়সার মালিকানাসম্পন্ন এমন মুসলিম ব্যবসায়ী যে তার টাকা-পয়সাকে ব্যবসায় লাগিয়েছে, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের এবং দ্বীয় অভাবী ভাইদের প্রয়োজন পূরণের জন্য বার্ষিক যাকাত আদায় করা তার উপর ওয়াজিব। স্থাবর সম্পত্তি, পশু, খাদ্যদ্রব্য ও গাড়ি ইত্যাদি সহ যা কিছু লাভের উদ্দেশ্যে কেনা-বেচার জন্যই রাখা হয়েছে, এ সবেরই যাকাত লাগবে। তবে এই প্রকার জিনিসের উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হলো, নেসাব পর্যন্ত পৌঁছান। আর সোনা অথবা রূপার **মূল্য অনুপাতেই এ সবের নেসাব নির্বাচিত হবে। সুতরাং সোনা ও** রূপার নেসাবের যা মূল্য হয়, ততটা সমপরিমাণ উল্লিখিত ব্যবসায় সামগ্রী যদি কারো নিকট থাকে, তাকে ২.৫% যাকাত আদায় করতে

হবে। তাই যদি কেউ এক লাখ রিয়াল সমপরিমাণ ব্যবসায় সামগ্রীর মালিক হয়, তাকে ২৫০০ রিয়াল যাকাত দিতে হবে। আর যারা শুধু ক্রয়-বিক্রয় করে, তাদের কর্তব্য হলো, প্রত্যেক বছরের শেষে তাদের নিকট মজুদ তহবিলের হিসাব করা এবং উহার যাকাত আদায় করা। যদি কোন ব্যক্তি তার নিকট সঞ্চিত অর্থের এক বছর অতিবাহিত হওয়ার দশদিন পূর্বে অন্য সামান কিনে নেয়, তাহলে তাকে সমষ্টির যাকাত আদায় করতে হবে। আর প্রথম যেদিন থেকে ব্যবসা আরম্ভ করবে, সেদিন থেকেই বছরের গণনা শুরু হবে। যাকাত বছরে একবারই লাগে। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত তার নিকট মজুদ জিনিসের যাকাত যেন প্রত্যেক বছর আদায় করে দেয়। যে পশুর খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হয়, তা যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে, সংখ্যায় নেসাব পর্যন্ত পৌঁছাক আর না পৌঁছাক তাতে কোন কিছু এসে যায় না। প্রচলিত মুদ্রায় তার মূল্য নেসাব পর্যন্ত পৌঁছালেই, তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে এবং প্রচলিত মুদ্রায় তার যাকাত আদায় করতে হবে।

শরীকানায় যাকাত

বর্তমানে মানুষ স্থাবর সম্পত্তি ইত্যাদিতে শেয়ার (অপরের সাথে অংশে শরীক হয়ে) যৌথভাবে কারবার করে। আবার কেউ কেউ এতে কয়েক বছর পর্যন্ত তার পুঁজি লাগিয়ে রাখে, যা বৃদ্ধি পেতেও পারে, আবার হ্রাস পেতেও পারে। এই (অপরের সাথে লাগিয়ে রাখা) অংশ-সমূহে যাকাত ওয়াজিব। কেননা, এটা ব্যবসায় সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক মুসলিমের উচিত প্রত্যেক বছর তার অংশের মূল্য সম্পর্কে জানবে এবং তার যাকাত আদায় করবে।

জমি থেকে উৎপন্ন ফসলের যাকাত

খেজুর, কিশমিশ, গম, যব এবং ধান ইত্যাদি সহ যে ফসল ও ফলাদি ওজন করা যায় ও সুরক্ষিত রাখা যায়, তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। তবে ফল-মূল (যা সুরক্ষিত রাখা যায় না) ও শাক-সব্জীতে যাকাত ওয়াজিব হয় না। আর উল্লিখিত ফসলে যাকাত তখনই ওয়াজিব হবে, যখন তা নেসাব পর্যন্ত পৌঁছবে। ফসলের নেসাব হলো, ৬১২ কিলো গ্রাম। এ প্রকারের জিনিসে এক বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্ত আরোপিত হবে না, বরং যখনই ফসল ও ফলাদি পেকে যাবে এবং তার ব্যবহার যোগ্যতা প্রকাশিত হয়ে যাবে, তখনই তাতে যাকাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর এই প্রকারের ফসলাদি যদি কোন প্রকারের শ্রম ব্যতীত বৃষ্টি অথবা নদীর বা প্রবহমান কূপের পানির সাহায্যে চাষাবাদ করা হয়, তাহলে উক্ত জমির উৎপাদিত ফসলের দশভাগের একভাগ যাকাত আদায় করতে হবে। কিন্তু যে জমি শ্রমের সাহায্যে সেচ করতে হয়, সে জমির উৎপন্ন ফসলের বিশ-ভাগের এক ভাগ লাগবে। যেমন মনে করুন, কোন ব্যক্তি গম লাগালো এবং তাতে ৮০০ কিলো গম উৎপাদিত হলো, এমতা- বস্থায় উহাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। কারণ, গমের নেসাব হলো, ৬১২ কিলো গ্রাম। আর উহাতে দশভাগের একভাগ, অর্থাৎ ৮০ কিলো লাগবে, যদি বিনা শ্রমে চাষাবাদ হয়ে থাকে। তবে যদি শ্রমের সাহায্যে চাষাবাদ হয়ে থাকে, তাহলে তাতে বিশভাগের এক ভাগ অর্থাৎ, ৪০ কিলো লাগবে।

চতুষ্পদ জন্তুর যাকাত

চতুষ্পদ জন্তু বলতে, উট, গরু-মোষ, ছাগল ও ভেড়াকে বুঝানো হয়েছে। নিম্নে বর্ণিত শর্তের ভিত্তিতে এ সবের যাকাত ওয়াজিব হবে।

১। নেসাব পর্যন্ত পৌঁছানো। উটের সর্ব নিম্ন নেসাব হলো, পাঁচ। ছাগল ও ভেড়ার নেসাব হলো, চল্লিশ। গরু ও মোষের নেসাব হলো, ত্রিশ। এই নেসাবের কম উট, গরু-মোষ, ছাগল ও ভেড়া থাকলে, তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

২। মালিকের নিকট এক বছর অতিবাহিত হওয়া।

৩। চারণভূমিতে চরে খাওয়া জানোয়ার হওয়া। অর্থাৎ চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে সেই জন্তুরই যাকাত আদায় করতে হবে, যারা বছরের অধিকাংশ দিনগুলোতে চরে খায়। কিন্তু যাদের কিনে খাওয়াতে হয় অথবা যাদের খাওয়ার ব্যবস্থা মালিক নিজে করে, সেগুলোতে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

৪। কাজের জন্য যেন না হয়। যাকে মালিক চাষের কাজে ও বোঝাবহন ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করে, তাতে যাকাত লাগবে না।

উটের যাকাত

উটের যাকাত তখনই ওয়াজিব হবে, যখন তা পাঁচ পর্যন্ত নেসাবে পৌঁছবে। সুতরাং যখন কোন মুসলিম পাঁচ থেকে নয়টি উটের মালিক হবে এবং তাতে এক বছর অতিবাহিত হয়ে যাবে, তাকে একটি ছাগল যাকাত হিসাবে দিতে হবে। আর ১০ থেকে ১৪টি উটের মালিক হলে, দু'টি ছাগল লাগবে। আর ১৫ থেকে ১৯টি উটের মালিক হলে, তিনটি ছাগল লাগবে। ২০ থেকে ২৪টি উটের মালিক হলে, ৪টি ছাগল লাগবে। ২৫ থেকে ৩৫টি উটের মালিক হলে, একটি 'বিনতে মাখায' অর্থাৎ, পূর্ণ এক বছরের একটি উটের বকনা বাছুর লাগবে। তবে যদি এক বছরের বকনা বাছুর না পায়, তাহলে 'ইবনে লাবুন' অর্থাৎ, পূর্ণ দুই বছরের একটি দামড়া বাছুর যথেষ্ট হবে। আর যদি ৩৬ থেকে ৪৫টি

উটের মালিক হয়, তাহলে তাকে একটি 'বিনতে লাবুন' অর্থাৎ, পূর্ণ দুই বছরের বকনা বাছুর লাগবে। আর ৪৬ থেকে ৬০ পর্যন্ত উটে 'হিক্কা' অর্থাৎ, পূর্ণ তিন বছরের একটি উটের বাছুর লাগবে। আর ৬১ থেকে ৭৫টি উটে 'জিযআ' অর্থাৎ, পুর্ণ চার বছরের একটি বকনা বাছুর লাগবে। ৭৬ থেকে ৯০টি উটে 'বিনতা লাবুন' অর্থাৎ, পূর্ণ দুই বছরের দু'টি বকনা বাছুর লাগবে। আর ৯১ থেকে ১২০টি উটের মালিক হলে, তাতে 'হিক্কাতান' অর্থাৎ, পূর্ণ তিন বছরের দু'টি বকনা বাছুর লাগবে। উল্লিখিত নেসাবের অতিরিক্ত হলে প্রত্যেক চল্লিশে একটি দুই বছরের বাছুর এবং প্রত্যেক পঞ্চাশে তিন বছরের বাছুর লাগবে।

নিম্নের তালিকাটি উটের যাকাতের ব্যাপারটা আরো সুন্দরভাবে বুঝতে সহায়তা করবে।

সংখ্যা	যাকাত লাগবে
৫ থেকে ৯ পর্যন্ত	১টি ছাগল
১০ থেকে ১৪ পর্যন্ত	২টি ছাগল
১৫ থেকে ১৯ পর্যন্ত	৩টি ছাগল
২০ থেকে ২৪ পর্যন্ত	৪টি ছাগল
২৫ থেকে ৩৫ পর্যন্ত	উটের পূর্ণ এক বছরের একটি বকনা বাছুর।
৩৬ থেকে ৪৫ পর্যন্ত	উটের পূর্ণ দু'বছরের একটি বকনা বাছুর।
৪৬ থেকে ৬০ পর্যন্ত	উটের পূর্ণ তিন বছরের বকনা বাছুর।
৬১ থেকে ৭৫ পর্যন্ত	উটের পূর্ণ চার বছরের বকনা বাছুর।
৭৬ থেকে ৯০ পর্যন্ত	উটের পূর্ণ এক বছরের দু'টি বাছুর।
৯১থেকে ১২০ পর্যন্ত	উটের পূর্ণ চার বছরের দু'টি বাছুর।

উল্লিখিত নেসাবের অতিরিক্ত হলে প্রত্যেক চল্লিশে একটি দুই বছরের

বাছুর এবং প্রত্যেক পঞ্চাশে তিন বছরের বাছুর লাগবে।

গরু ও মোষের যাকাত

যদি কোন ব্যক্তি ৩০ থেকে ৩৯টি গরু ও মোষের মালিক হয়, তাহলে তাকে পূর্ণ এক বছরের একটি বাছুর যাকাত হিসাবে দিতে হবে। আর যদি ৪০ থেকে ৫৯টি গরু ও মোষের মালিক হয়, তাহলে পূর্ণ দুই বছরের একটি বাছুর দিতে হবে। ৬০ থেকে ৬৯টি গরু ও মোষের মালিক হয়, তাহলে পূর্ণ এক বছরের দু'টি বাছুর লাগবে। আর ৭০ থেকে ৭৯টির মালিক হলে, একটি এক বছরের ও একটি দুই বছরের বাছুর লাগবে। অতঃপর প্রত্যেক ৩০টায় একটি এক বছরের এবং প্রত্যেক ৪০টায় দুই বছরের বাছুর লাগবে। নিম্নের তালিকায় দেখুন,

সংখ্যা	যাকাত লাগবে
৩০ থেকে ৩৯ পর্যন্ত	পূর্ণ এক বছরের বাছুর।
৪০ থেকে ৫৯ পর্যন্ত	পূর্ণ দু'বছরের বাছুর।
৬০ থেকে ৬৯ পর্যন্ত	পূর্ণ এক বছরের দু'টি বাছুর।
৭০ থেকে ৭৯ পর্যন্ত	১টি ১বছরের ও ১টি দু'বছরের বাছুর।

ছাগলের যাকাত

যদি কোন ব্যক্তি ৪০ থেকে ১২০টি ছাগলের মালিক হয়, তাহলে একটি ছাগল যাকাত হিসাবে আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে। আর ১২১ থেকে ২০০টি ছাগলের মালিক হলে, দু'টি ছাগল তার উপর ওয়াজিব হবে।২০১ থেকে ৩০০ পর্যন্ত তিনটি ছাগল লাগবে। ৩০১ থেকে ৪০০ পর্যন্ত চারটি ছাগল দিতে হবে। ৪০১ থেকে ৫০০ পর্যন্ত পাঁচটি ছাগল লাগবে। অতঃপর প্রত্যেক ১০০টায় একটি করে লাগবে।

তালিকা

সংখ্যা	যাকাত লাগবে
৪০ থেকে ১২০ পর্যন্ত	একটি ছাগল।
১২১ থেকে ২০০ পর্যন্ত	দু'টি ছাগল।
২০১ থেকে ৩০০ পর্যন্ত	তিনটি ছাগল।
৩০১ থেকে ৪০০ পর্যন্ত	চারটি ছাগল।
৪০১ থেকে ৫০০ পর্যন্ত	পাঁচটি ছাগল।

যাকাতের হকদার

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴾

[التوبة ٦٠]

অর্থাৎ, "এই সাদকাসমূহ মূলতঃ ফকীর ও মিসকীনদের জন্য, আর তাদের জন্য যারা সাদকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত এবং তাদের জন্য যাদের মন জয় করা হলো উদ্দেশ্য। সেই সাথে এটা গলদেশের মুক্তিদানে ও ঋণ ভারাক্রান্তদের সাহায্যে, আল্লাহর পথে ও পথিক মুসাফিরদের কল্যাণে ব্যয় করার জন্য; এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফরয। আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি সুবিজ্ঞ ও সুবিবেচক।"(সূরা তাওবাঃ৬০) এই আয়াতে মহান আল্লাহ আট প্রকার মানুষের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা যাকাতের হকদার। ইসলামে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা হয় সামাজিক উন্নয়নে ও অভাবীদের মধ্যে। অন্যান্য ধর্মের ন্যায় যাকাত শুধু আলেম-

উলামাদের জন্য নির্দিষ্ট নয়।

১। ফকীর তাকেই বলা হয়, যার নিকট প্রয়োজনের অর্ধেক থাকে।
২। মিসকীন তাকে বলা হয়, যার নিকট তার প্রয়োজনের অর্ধেক থেকে বেশী থাকে, কিন্তু তাতে তার যথেষ্ট হয় না। সুতরাং তাকে তার প্রয়োজনানুযায়ী ততটা পরিমাণ অর্থ যাকাত থেকে দেওয়া যাবে, যা তার কয়েক মাস অথবা এক বছরের জন্য যথেষ্ট হবে।

৩। সাদকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিরা। অর্থাৎ, যাদেরকে বাদশাহ কর্তৃক যাকাত আদায়ের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। তাদেরকে তাদের কাজানুযায়ী উচিত অর্থ দিতে হবে যদিও তারা ধনী হয়।
৪। যাদের মন জয় করার উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ, এমন সর্দার যার বংশের লোকেরা তার অনুসরণ করে, যার ইসলাম গ্রহণের আশা করা যায় অথবা যার থেকে মুসলিমদের অনিষ্টের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে। অনুরূপ ইসলামে নবাগত মুসলিম, এ সকল প্রকারের মানুষকে তাদের মন জয় করার উদ্দেশ্যে এবং তাদের ঈমানকে আরো সুদৃঢ় করতে যাকাত থেকে দেওয়া যাবে।
৫। অনুরূপ ক্রীতদাসকে তার দাসত্ব জীবন থেকে মুক্তি দিতে এবং দুশমনের হাতে বন্দীদের ছাড়াতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।
৬। ঋণীদেরকে। অর্থাৎ, যাদের উপর ঋণের বোঝা, তাদেরকে ঋণ পরিশোধের জন্য যাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে। তবে শর্ত হলো, তাকে মুসলিম হতে হবে এবং সে এমন কোন ধনী ব্যক্তি যেন না হয়, যে তার ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম। আর তার ঋণ যেন এমন হয়, যা অতিসত্বর আদায় করা দরকার এবং উহা কোন অন্যায় কাজে যেন গ্রহণ করা না হয়ে থাকে।

৭। আল্লাহর পথে। অর্থাৎ, যে মুজাহিদ বিনা কোন বেতনে আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তাদের জন্য অথবা তাদের অস্ত্র-শস্ত্র কেনার জন্য যাকাত থেকে দেওয়া যাবে। অনুরূপ যারা শরীয়তী জ্ঞানার্জন করে, তারাও জিহাদের আওতায় পরে। সুতরাং এমন কেউ যদি থাকে, যে শরীয়তী জ্ঞানার্জন করতে চায়, কিন্তু তার অর্থের অভাব, এমতাবস্থায় তাকে শরীয়তী জ্ঞানার্জনে সক্ষম করতে যাকাত থেকে দেওয়া জায়েয হবে।

৮। মুসাফির। অর্থাৎ, যে পথের মধ্যে নিঃস্ব হয়ে গেছে। তার নিকট তার বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছার মত কিছুই নাই, এমতাবস্থায় তাকে বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যাকাত থেকে দেওয়া যাবে, যদিও সে তার শহরে ধনী ব্যক্তি হয়।

যাকাতের অর্থ কোন মসজিদ নির্মাণে এবং রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি মেরামতের কাজে ব্যয় করা যাবে না।

বিঃদ্রঃ

১। সমুদ্র থেকে অর্জিত জিনিসে যাকাত ওয়াজিব হবে না, যদি তা ব্যবসার জন্য না হয়। যেমন, মণি-মুক্তা, প্রবাল ও মাছ ইত্যাদি।

২। ভাড়াটে ঘরে, ফ্যাক্টরী ইত্যাদিতে যাকাত ওয়াজিব নয়। তবে তা থেকে উপার্জিত অর্থে যাকাত ওয়াজিব হবে, যদি এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। যেমন মনে করুন, এক ব্যক্তি বাড়ী ভাড়া দিল এবং বাড়ীর ভাড়া সে পেল, এমতাবস্থায় তার এই ভাড়া থেকে উপার্জিত অর্থ যদি নেসাব পর্যন্ত পৌঁছে যায় ও এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে।

أحكام الأطعمة
খাদ্য সম্পর্কীয় বিধান

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে পাক ও পবিত্র খাদ্য গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। আর নাপাক অপবিত্র খাদ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তাই তিনি বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ (البقرة ١٧٢

অর্থাৎ, "হে ঈমানদারগণ, যেসব রুযী আমি তোমাদের দান করেছি, তার মধ্যে পবিত্র জিনিস ভক্ষণ করো"। (বাক্বারাঃ ১৭২) বস্তুতঃ হারাম বলে ঘোষিত বস্তু ব্যতীত সব খাদ্যই আমাদের জন্য হালাল। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর মু'মিন বান্দাদের জন্য পাক ও পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করে দিয়েছেন যাতে তারা তার দ্বারা উপকৃত হতে পারে। সুতরাং আল্লাহর নেয়ামত দ্বারা কোন অন্যায় ও শরীয়ত বিরোধী কাজে সাহায্য গ্রহণ করা বৈধ নয়।। খাদ্য ও পানীয় বস্তুর মধ্যে যা হারাম, তার সুস্পষ্ট বর্ণনা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন,

﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ (الأنعام١١٩

অর্থাৎ, "আল্লাহ তোমাদের উপর যা কিছু হারাম করেছেন, তা তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন, তবে নিরুপায় অবস্থায় তোমরা উক্ত হারাম বস্তুও আহার করতে পারো"। (আনআমঃ ১১৯) সুতরাং যা হারাম বলে ঘোষিত হয়নি, তা হালাল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন,

((إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ، فَلاَ تُضَيِّعُوْهَا، وَحَدَّدَ حُدُوْداً فَلاَ تَعْتَدُوْهَا؛ وَحَرَّمَ

أَشْيَاءَ؛ فَلاَ تَنْتَهِكُوْهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَّكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ؛ فَلاَ تَبْحَثُوْا عَنْهَا) رواه الطبراني.

অর্থাৎ, "আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের প্রতি কতকগুলো বিষয় ফরয করেছেন, তা নষ্ট করো না। কতকগুলো সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা লঙ্ঘন করো না। কতকগুলো জিনিস হারাম(অবশ্য পরিত্যাজ্য) করেছেন, সেগুলোর মধ্যে লিপ্ত হয়ে পাপ করো না। আর তোমাদের প্রতি দয়াপূর্বক হয়ে কতকগুকলো জিনিস সম্পর্কে ইচ্ছা করেই নীরব রয়েছেন, সে ব্যাপারে খোঁজাখুঁজি করো না" (তাবরানী)

প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্য, পানীয় ও পোশাকাদি, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক হারাম বলে বর্ণিত হয়নি, সেগুলোকে হারাম বলা যাবে না। মূলতঃ প্রত্যেক পবিত্র ও ক্ষতিবিহীন খাদ্য হালাল। তবে অপবিত্র খাদ্য, যেমন মৃত, রক্ত, মাদকদ্রব্য, ধুমপান সামগ্রী এবং এমন জিনিস, যার সাথে অপবিত্র কোন কিছু মিশে গেছে, এসবই হারাম। কেননা, এগুলো ক্ষতিকর। আর মৃত বলতে, শরীয়তী পদ্ধতিতে জবাই করা ব্যতীতই যার প্রাণ নাশ করা হয়েছে তাকে বুঝানো হয়েছে। আর রক্ত বলতে, জবাই কৃত পশু থেকে নির্গত প্রবহমান রক্ত। তবে জবাই করার পর মাংসে এবং রগসমূহে অবশিষ্ট রক্ত বৈধ।

যে সমস্ত খাদ্য হালাল, তা দু'প্রকারের। যথা, (১) পশুজাত (২) সমূহ উদ্ভিদ। এ সবের মধ্যে যাতে কোন প্রকারের ক্ষতি নেই, সেগুলো সবই হালাল। আর পশুজাত দু'প্রকারের। এক প্রকার জীব-জানোয়ার যারা স্থলে বসবাস করে। আর এক প্রকার, যারা সমুদ্রে বসবাস করে। যে সমস্ত পশু সমুদ্রে বাস করে, সে সমস্ত পশুই হালাল, তাতে জবাই করার শর্ত

আরোপিত হবে না। কারণ, সমুদ্রের মৃত হালাল। আর স্থলে বসবাসকারী পশুর মধ্যে যে কয়েক প্রকার পশুকে ইসলাম হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছে, সেগুলো ব্যতীত সবই হালাল। যেমন,

১। পাল্তুগাধা।

২। হায়না ব্যতীত এমন দাঁত বিশিষ্ট জানোয়ার, যারা দাঁত দিয়েই ছিঁড়ে খায়।

৩। সব রকমের পাখিই হালাল, তবে যে পাখি থাবা দিয়ে আক্রমণ ক'রে শিকার করে, সে পাখি হারাম। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,

((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِّنَ السَّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِيْ مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ)) رواه مسلم ١٩٣٤

অর্থাৎ, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম প্রত্যেক দাঁত বিশিষ্ট হিংস্র পশু এবং থাবা দিয়ে আক্রমণকারী পাখি খেতে নিষেধ করেছেন"। (মুসলিম) অনুরূপ যে সব পাখিরা পচা-গলা ও নোংরাজাতীয় জিনিস খায়, সে সব পাখিও হারাম। যেমন, শকুনি, বাজপাখি এবং কাক। নোংরা আবর্জনা আহার করার কারণেই এগুলো হরাম বলে ঘোষিত হয়েছে। ঘৃণিত জীব-জন্তুও হারাম। যেমন, সাপ, ইন্দুর ও যমীনে বিচরণশীল কীট-পতঙ্গ।

উপরোল্লিখিত পশু-পাখি ব্যতীত সবই হালাল। যেমন, ঘোড়া, গৃহপালিত পশু (উট, গরু, মোষ, ছাগল-ভেঁড়া), মুরগী, জংলী গাধা, হরিণ, উট পাখি এবং খরগোশ ইত্যাদি। তবে 'জাল্লালাহ' এসবের ব্যতিক্রম। আর 'জাল্লালাহ' ঐ পশুকে বলা হয়, যার অধিকাংশ খাদ্যই হচ্ছে নোংরাজাতীয় জিনিস ও অপবিত্র মল। এই ধরনের পশুকে তিন দিন

পর্যন্ত বদ্ধ রেখে পবিত্র খাদ্য দিতে হবে। তবেই তাকে খাওয়া বৈধ হবে। অন্যথায় তা হারাম হবে। পিয়াজ, রশুন সহ অতি দুর্গন্ধময় জিনিস আহার করা অপছন্দনীয়। বিশেষ করে মসজিদে আসার সময়। যদি কেউ নিরুপায় হয়ে হারাম কৃত বস্তু আহার করতে বাধ্য হয়, অর্থাৎ আহার না করলে প্রাণ নাশের আশঙ্কা থাকে, তাহলে ততটুকু পরিমাণ তা থেকে আহার করা তার জন্য বৈধ, যাতে তার প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়। তবে বিষ কোন অবস্থাতেই গ্রহণ করা যাবে না। যদি কেউ ঘেরাবিহীন বাগানের কোন গাছের ফল গাছের মধ্যে অথবা পড়ে থাকা অবস্থায় পায়, যার কোন রক্ষক নেই,সে ফল আহার করা তার জন্য জায়েয। তবে বয়ে নিয়ে যাওয়া ও গাছে ওঠে বা কোন কিছু দিয়ে ফল পাড়া তার জন্য বৈধ নয়। অনুরূপ বিনা প্রয়োজনে জমা করা ফলও সে খেতে পারে না।

জবাই করার বিধান

যেহেতু স্থলচর প্রাণী বৈধ হওয়ার শর্তই হলো, শরীয়তী পদ্ধতিতে তা জবাই করা। আর জবাই বলতে স্থলচর বৈধ পশুর কণ্ঠনালী ও খাদ্যনালীকে কর্তন করা বুঝায়। যে জীব-জন্তু জবাই করা সম্ভব, তা বিনা জবাইয়ে হালাল হবে না। কারণ, বিনা জবাইয়ের পশু মৃত বলে গণ্য হয়।

জবাইয়ের শর্তাবলী

১। জবাইকারীর জবাই করার উপযুক্ত হওয়া। অর্থাৎ, তাকে জ্ঞানসম্পন্ন ও আসমানী দ্বীনে বিশ্বাসী হতে হবে। তাতে সে মুসলমান হোক অথবা আহলে কিতাব হোক। সুতরাং কোন পাগল, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি ও ছোট শিশুর জবাই করা পশু হালাল হবে না। কেননা, অজ্ঞতার কারণে

তাদের দ্বারায় জবাইয়ের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে অর্জিত হয় না। কোন মূর্তিপূজক, কাফের অথবা অগ্নিপূজক কিংবা কবরপূজক কর্তৃক জবাই করা পশুও বৈধ নয়।

২। অস্ত্রের দ্বারা জবাই করা। সুতরাং এমন সব ধারালো অস্ত্র দিয়ে জবাই করা যায়, যার ধারে রক্ত প্রবাহিত হয়, তা সে লোহা হোক অথবা পাথর হোক কিংবা অন্য কোন কিছু হোক। তবে হাড় ও নখ দিয়ে জবাই করা জায়েয নয়।

৩। কণ্ঠনালী কর্তন করা। অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস যাতায়াত নালী, খাদ্যনালী এবং ঘাড়ের উভয় রগের কোন এক রগ কর্তন করা।

এই স্থানটির মধ্যে জবাইকে সীমাবদ্ধ করা এবং বিশেষভাবে এই জিনিসগুলো কর্তন করতে বলার মধ্যে কৌশল বা হিকমত হলো, যাতে রক্ত প্রবাহিত হয়। কারণ এই স্থানটি অনেকগুলো রগের মূল কেন্দ্র। তাছাড়া এতে তাড়াতাড়ি প্রাণ নাশ হয়, যাতে গোশত হয় সুস্বাদু ও পশুর কষ্ট হয় কম। উপায় না থাকার কারণে যে পশুর উল্লিখিত স্থানে জবাই করতে অক্ষম হবে, যেমন শিকার ইত্যাদি, সে পশুর যে কোন স্থানে আহত বা জখম করাই তার জবাই বলে পরিগণিত হবে। আর যে পশু কোন দুর্ঘটনায় আহত হবে, যেমন গলায় ফাঁস পড়ে যাওয়া, উপর হতে কোন ভারী জিনিসের আঘাত লাগা, কোন সংঘর্ষে আহত হওয়া, কিংবা কোন হিংস্র জন্তুর আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাওয়া ইত্যাদি পশুগুলো জীবিত অবস্থায় পাওয়া গেলে, জবাই করে তা খাওয়া হালাল।

৪। জবাইকারীর জবাই করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা। 'বিসমিল্লাহ'এর সাথে 'আল্লাহু আকবার' বলাও সুন্নাত।

জবাই করার আদব

১। ভোঁতা কোন অস্ত্র দিয়ে জবাই করা অপছন্দনীয়।
২। পশুকে দেখিয়ে অস্ত্রে ধার দেওয়া ঠিক নয়।
৩। কেবলা ব্যতীত পশুর মুখ অন্য দিকে করিয়ে জবাই করাও ঠিক নয়।
৪। মরার পূর্বে পশুর ঘাড়কে মোচড়ানো মাকরুহ (ঘৃণিত) কাজ। গরু ও ছাগলকে বাম দিকে কাত করে ফেলে জবাই করা সুন্নাত। (আর উটের ব্যাপারে সুন্নাত হলো) দাঁড় করিয়ে ডান হাত বেঁধে জবাই করা। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

শিকার করা

প্রয়োজনে শিকার করা জায়েয। তবে খেলাধূলার জন্য শিকার করা একটি অপছন্দনীয় কাজ। শিকার কৃত পশু-পাখির দু'টি অবস্থা হতে পারেঃ-

১। হয় তাকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া যাবে, এমতাবস্থায় তাকে জবাই করা অত্যাবশ্যক।
২। কিংবা তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যাবে অথবা জীবিত অবস্থায়, কিন্তু সে জীবন খুবই সাময়িক, এমতাবস্থায় সে পশু হালাল।

জবাইকারীর উপর আরোপিত শর্ত শিকারীর উপরেও অর্পিত হবে। যেমন-

১। জ্ঞানসম্পন্ন মুসলিম অথবা কিতাবী হওয়া। সুতরাং কোন পাগল, অথবা নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি অথবা অগ্নিপূজক কিংবা মূর্তিপূজক দ্বারা শিকার কৃত পশু মুসলিমদের জন্য খাওয়া বৈধ নয়।
২। অস্ত্র এমন ধারালো হতে হবে, যাতে রক্ত প্রবাহিত হয়। আর তা

যেন নখ ও হাড়জাতীয় কোন কিছু না হয়। আর শিকার যেন অস্ত্রের ধারে আহত হয়, তার ভারে নয়। তবে শিকারী কুকুর ও পাখি, যাদের দিয়ে শিকার করা হয়, তারা যদি শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে তাদের দ্বারা শিকার কৃত পশু হালাল। আর এদের শিক্ষা হলো, যখন শিকারের জন্য যেতে বলবে, তখনই যাবে। না বললে যাবে না। আর শিকার যখন ধরবে, তখন তার এই ধরা মালিকের জন্য হবে, নিজের জন্য নয়।

৩। অস্ত্র যেন শিকারের উদ্দেশ্যেই চালানো হয়। সুতরাং কোন অস্ত্র যদি হাত থেকে পড়ে কোন শিকার হত্যা করে ফেলে, তাহলে তা খাওয়া হালাল হবে না। কেননা তাতে শিকারের উদ্দেশ্য থাকছে না। অনুরূপ শিকারী কুকুর যদি নিজেই গিয়ে কোন শিকার হত্যা করে ফেলে, তাহলে সেটাও হালাল হবে না। কারণ, তাকে তার মালিক শিকারের উদ্দেশ্যে পাঠাইনি। যদি কেউ শিকারকে নিশানা করে কোন কিছু চালায়, আর তা গিয়ে যদি অন্য কাউকে লাগে অথবা একদল শিকার যদি তাতে মারা যায়, তাহলে সমস্ত শিকারই হালাল হবে।

৪। তীর ও শিকারী কুকুর ইত্যাদি পরিচালনা করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা। 'বিসমিল্লাহ' এর সাথে 'আল্লাহু আকবার' বলাও সুন্নাত।

সাবধানতা! রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) যে তিনটি ব্যাপারে কুকুর পোষার অনুমতি দিয়েছেন, তা ব্যতীত অন্য কোন কিছুর উদ্দেশ্যে তা পোষা হারাম। আর যে তিনটে কারণে অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তা হলো, শিকারের উদ্দেশ্যে অথবা গবাদিপশু কিংবা চাষ ক্ষেতের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে।

أحكام اللباس
পোশাক-পরিচ্ছদের বিধান

ইসলাম হলো সৌন্দর্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দ্বীন। সুন্দর পরিষ্কার পোশাকে সেজেগুজে নিজেকে প্রকাশ করা মুসলিমের জন্য বৈধ এবং এতে উদ্বুদ্ধও করা হয়েছে। আর পূত-পবিত্র মহান আল্লাহ সৌন্দর্য ও আবরণের জন্য পোশাক সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴾ (الأعراف:٢٦)

অর্থাৎ, "হে বনী-আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজ-সজ্জার বস্ত্র। আর (বেশভুষার তুলনায়)পরহেযগারীর পোশাক, এটি সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর কুদরতের অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।" (আ'রাফঃ ২৬) পোশাকের ব্যাপারে (ইসলামের) মূল নীতি হলো, সব পোশাকই বৈধ, কেবল সে পোশাক ছাড়া, যার হারাম হওয়ার কথা পরিষ্কারভাবে (ইসলামে) বর্ণিত হয়েছে। ইসলাম এমন কোন পোশাককে নির্দিষ্ট করে নি যে, কেবল তা-ই পরিধান করা উচিত। তবে এ ব্যাপারে এমন কিছু নীতিমালা পেশ করেছে যে, মুসলিমের পোশাক এই নীতির আওতাভুক্ত হওয়া জরুরী। আর তা হলো,

১। পোশাকটি লজ্জাস্থান আবৃতকারী যেন হয় তার প্রকাশকারী যেন না হয়।

২। এমন পোশাক যেন না হয়, যা কাফেরদের অথবা কোন কোন অন্যায় কাজ সম্পাদনকারী বলে পরিচিত ব্যক্তিদের সাদৃশ্য গ্রহণ ক'রে পরা হয়।

৩। তাতে যেন অপচয় না করা হয়।

পোশাকের ব্যাপারে এই নীতিমালার খেয়াল রেখে মানুষ তার প্রয়োজনানুযায়ী এবং তার সমাজে প্রচলিত যে কোন পোশাক পরিধান করতে পারবে। পোশাকের ব্যাপারে যা যা নিষেধ তা হলো,

১। পুরুষদের জন্য রেশমের কাপড় ও সোনা পরা। তবে মহিলারা এ সবকিছু পরতে পারবে। কারণ, আলী ইবনে আবী ত্বালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) রেশমের কাপড় স্বীয় ডান হাতে ও সোনা স্বীয় বাম হাতে ধারণ ক'রে বললেন,

((إِنَّ هَـذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي)) {رواه النسائي٥٠٥٩ وأبوداود ٤٠٥٧ وابن ماجة ٣٥٩٥}

অর্থাৎ, "এই জিনিস দু'টি আমার উম্মতের পুরুষদের উপর হারাম।" (নাসায়ী ৫০৫৯, আবূ দাউদ ৪০৫৭, ইবনে মাজা ৩৫৯৫, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে ইবনে মাজা আলবানীঃ ৩৫৯৫) তবে পুরুষদের রূপার আংটি পরাতে অথবা এমন জিনিস পরাতে কোন দোষ নেই যাতে সামান্য রূপা আছে এবং যেটা পরতে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

২। এমন পোশাক যাতে কোন প্রাণীর ছবি আছে। সুতরাং এমন পোশাক পরা মুসলিমের জন্য জায়েয নয়, যার মধ্যে কোন মানুষ অথবা পশু-পাখীর ছবি আছে। তাতে তা কাপড়ে হোক বা সোনার তৈরী জিনিসে হোক এবং পরা হয় এমন যে কোন জিনিসে হোক না কেন। আয়েশা

(রাযীআল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত যে, তিনি একটি বালিশ কিনে ছিলেন যাতে ছবি ছিলো। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তা দেখে দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন, প্রবেশ করলেন না। আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা) বলেন, আমি তাঁর চেহারায় অপছন্দের ভাব বুঝতে পারলাম। তাই বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করছি, আমি কি অন্যায় করেছি? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন, "এই বালিশটা কোত্থেকে এলো? আমি বললাম, এটা আপনার বসার ও হেলান দেওয়ার জন্য ক্রয় করেছি। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন,

((إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ)) ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ)) متفق عليه ٢١٠٥-٢١٠٧

অর্থাৎ, "অবশ্যই এই চিত্রকরদের কিয়ামতের দিন কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা চিত্রিত করেছো তাতে প্রাণ দাও।" অতঃপর তিনি বললেন, "নিশ্চয় সে বাড়িতে ফেরেশতা প্রবেশ
করেন না, যে বাড়িতে ছবি থাকে।" (বুখারী২ ১০৫-মুসলিম ২ ১০৭)

৩। পুরুষদের গাঁটের নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরাও হারাম। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ)) رواه البخاري ٥٧٨٧

অর্থাৎ, "গাঁটের নীচের সে অংশটুকু জাহান্নামে যাবে, যার নীচে

কাপড় ঝুলে।" (বুখারী ৫৭৮৭) লম্বা জামা, পায়জামা, প্যান্ট এবং লুঙ্গি ইত্যাদি সবই (গাঁটের নীচে) ঝুলানো নিষেধ। আর এটা তার সাথে নির্দিষ্ট নয়, যে অহংকার ক'রে ঝুলায়। হ্যাঁ, যে গর্ব ও অহংকার ক'রে ঝুলায় তার শাস্তি হবে অতীব কঠিন। যেমন, ইবনে উমার (রাযীআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) متفق عليه ٣٦٦٥-٢٠٨٥

অর্থাৎ, "যে গর্ব ও অহংকার ক'রে(গাঁটের নীচে) কাপড় ঝুলায়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে রহমতের দৃষ্টিতে দেখবেন না।" (বুখারী ৩৬৬৫-মুসলিম ২০৮৫) তবে মহিলারদের জন্য জরুরী হচ্ছে, তারা ততদূর পর্যন্ত কাপড় ঝুলাবে, যাতে তাদের পা দু'টি ঢাকা যায়।

৪। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য এমন পাতলা-ঝলঝলে কাপড় পরা জায়েয নয়, যা লজ্জাস্থান আবৃত করে না এবং এমন সংকীর্ণ যেন না হয়, যাতে তা (লজ্জাস্থান) প্রকাশ হয়ে পড়ে।

৫। পোশাকে পুরুষদের উপর মহিলাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা এবং মহিলাদের উপর পুরুষদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা হারাম। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

((لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ)) رواه البخاري ٥٨٨٥

অর্থাৎ, "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) অভিসম্পাত করেছেন সেই পুরুষদের, যারা মহিলাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে এবং সেই মহিলাদের, যারা পুরুষদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে।" (বুখারী ৫৮৮৫)

৬। কাফেরদের পোশাকের সাদৃশ্যগ্রহণ করাও হারাম। কাজেই মুসলিমের এমন পোশাক পরা জায়েয নয়, যা কাফেরদের জন্য নির্দিষ্ট। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আ'স (রাযীআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আমার পরিহিত দু'টি গেরুয়া রঙের কাপড় দেখে বললেন,

((إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا)) مسلم ٢٠٧٧

অর্থাৎ, "অবশ্যই এটা কাফেরদের কাপড়, অতএব তা পরিধান করো না।" (মুসলিম ২০৭৭)

পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে বর্ণিত সুন্নাত ও আদবসমূহ

১। নতুন পোশাক পরার সময় যে সুন্নাতটি মুসলিমকে পালন করতে হয়, তা হলো দুআ পড়া। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) যখন কোন নতুন কাপড় পেতেন, তখন সেটা জামা অথবা পাগড়ি যা হতো সেই নাম উচ্চারণ ক'রে বলতেন,

((اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ، أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ ، وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ)) [رواه أبو داود: ٤٠٢٠].

(আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু, আন্তা কাসাউতানী-হ, আসআলুকা মিন খায়রিহি অ খায়রি মা সুনিয়া লাহু, অ আউযু বিকা মিন শার্‌রিহি অ শার্‌রি মা সুনিয়া লাহ) অর্থাৎ, হে আল্লাহ তোমারই জন্য সকল প্রশংসা। তুমিই আমাকে এ কাপড় পরিয়েছো। আমি তোমার কাছে এর মধ্যে নিহিত কল্যাণ ও এটা যে জন্য তৈরী করা হয়েছে সেসব কল্যাণ প্রার্থনা

করছি। আর আমি এর অনিষ্ট এবং এটি যার জন্য তৈরী করা হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করছি। (আবূ দাউদ ৪০২০, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে আবূ দাউদ আলবানীঃ ৪০২০)

২। ডান দিক থেকে পরতে আরম্ভ করাও সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদীসে এসেছে। তিনি বলেছেন,

((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ)) متفق عليه: ٤٢٦-٢٦٨

অর্থাৎ, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পবিত্রতা অর্জন, মাথা আঁচড়া এবং জুতা পরা সহ প্রত্যেক কাজে যতদূর সম্ভব ডান দিক থেকে আরম্ভ করাকেই ভালবাসতেন।" (বুখারী ৪২৬-মুসলিম২৬৮) অনুরূপ যখন জুতা পরিধান করবে, তখনও ডান দিক হতে শুরু করবে এবং যখন খুলবে, তখন বাম দিক থেকে খুলবে। কেননা, আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا)) رواه البخاري ٥٨٥٦، مسلم ٢٠٩٧

অর্থাৎ, "তোমাদের কেউ যখন জুতো পরবে, তখন সে যেন ডান পা দিয়ে শুরু করে এবং যখন জুতো খুলবে, তখন যেন বাঁ পা থেকে আরম্ভ করে। আর জুতো পরলে দু'টোই পরবে, খুলে রাখলে দু'টোই খুলে রাখবে।" (বুখারী ৫৮৫৬, মুসলিম ২০৯৭)

৩। মুসলিমের স্বীয় কাপড় ও শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাও সুন্নাতের আওতাভুক্ত বিষয়। কাজেই সে এ দু'টোর (কাপড় ও শরীরের) পবিত্র রাখার যত্ন নিবে। কেননা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা হলো প্রত্যেক সৌন্দর্যের এবং চমৎকার দৃশ্যের মূল। ইসলাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং শরীর ও কাপড়ের পরিচ্ছন্নতার বিশেষ যত্ন নিতে বলেছে।

৪। সাদা কাপড় পরিধান করা মুস্তাহাব। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ)) رواه أبوداود وغيره ٣٨٧٨

অর্থাৎ, "তোমাদের কাপড়ের মধ্যে সাদা (রঙের) কাপড় পরো। কারণ এটা তোমাদের উত্তম কাপড় এবং এতেই তোমাদের মৃতদেরকে কাফনাও।" (আবূ দাউদ ৩৮৭৮, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে আবূ দাউদ আলবানীঃ ৩৮৭৮)

৫। রকমারি পোশাক ও বৈধ সৌন্দর্য গ্রহণের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ﴾ [الفرقان:٦٧]

অর্থাৎ, "এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী।" (ফুরক্বানঃ ৬৭) আর বুখারী শরীফের হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

অসাল্লাম) বলেছেন,

((كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ)) رواه البخاري

অর্থাৎ, "খাও, পান করো, পরিধান করো এবং সাদক্বা করো অপচয় ও অহংকার ছাড়াই।" (বুখারী)

أحكام النكاح
বিবাহের বিধান

বিবাহের শর্তাবলী

১। **স্বামী-স্ত্রীর সম্মতি।** অতএব কোন প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষকে এমন নারীর সাথে বিবাহ করতে বাধ্য করা যাবে না, যাকে সে চায় না। অনুরূপ কোন প্রাপ্তবয়স্কা, বুদ্ধিসম্পন্না নারীকে এমন কোন পুরুষের সাথে বিবাহ করতে বাধ্য করা যাবে না, যাকে সে চায় না। নারীর সম্মতি ব্যতীত তার বিবাহ দেওয়াকে ইসলাম নিষেধ করেছে। যখন নারী কোন পুরুষের সাথে বিবাহ করতে অসম্মতি প্রকাশ করবে, তখন এ ব্যাপারে কেউ তাকে বাধ্য করতে পারবে না, যদিও সে তার পিতা হয়।

২। ওয়ালী। ওয়ালী ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হবে না। কারণ, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "ওয়ালী ব্যতীত বিবাহ নেই।" (তিরমিজী ১০২০, হাদীসটি সহীহ। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে তিরমিযী আলবানী ১১০১) সুতরাং যদি কোন নারী ওয়ালী ব্যতীতই বিবাহ করে, তাহলে তার বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। চাই সে নিজে নিজেই বিয়ে করুক, কিংবা অন্য কাউকে অভিভাবক নিযুক্ত করে বিয়ে করুক। আর কোন কাফির কোন মুসলিম নারীর অভিভাবক হতে পারে না। যার ওয়ালী নেই, তার ওয়ালী হবে দেশের বাদশাহ।

আর ওয়ালী হলো, প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিসম্পন্ন নারীর 'আসবা' জাতীয় আত্মীয়-স্বজন। যেমন, পিতা ও পিতা যাকে অসীয়ত করবে। অতঃপর দাদা। এইভাবে পর্যায়ক্রমে উর্ধ্বে যাবে। যে যত নিকটের হবে, তার তত অগ্রাধিকার থাকবে। অতঃপর পুত্র ও পুত্রের পুত্র এইভাবে পর্যায়ক্রমে নিম্নে যাবে। অতঃপর আপন ভাই। তারপর বৈমাত্রেয় ভাই। অতঃপর

আপন ভায়ের ও বৈমাত্রেয় ভায়ের পুত্ররা। যে যত নিকটের হবে, তার তত অগ্রাধিকার থাকবে। অতঃপর আপন চাচা। তারপর বৈমাত্রেয় চাচা। অতঃপর চাচাদের পুত্ররা। অতঃপর বাপের চাচা ও তার ছেলেরা। তারপর দাদার চাচা ও তার ছেলেরা। প্রত্যেক ওয়ালীর কর্তব্য হলো, বিবাহের পূর্বে মেয়ের নিকট অনুমতি নেওয়া। আর ওয়ালীর শর্ত আরোপ করার মধ্যে কৌশল হলো, ব্যভিচারের উপকরণাদি বন্ধ করে দেওয়া। কারণ ব্যভিচারী এ ব্যাপারে অক্ষম নয় যে, সে মহিলাকে বলবে, তুমি তোমাকে এতটা মহরের বিনিময়ে আমার সাথে বিবাহ করিয়ে দাও। অতঃপর আপন দু'জন সঙ্গী-সাথী, অথবা অন্য দু'জন কাউকে এই বিয়ের সাক্ষীরূপে রেখে নেবে।

৩। দু'জন সাক্ষীদাতা। বিবাহে দুই বা দুয়ের অধিক ন্যায়পরায়ণ দ্বীনদার মুসলিমের উপস্থিত থাকা অত্যাবশ্যক। অনুরূপ এই দু'জনকে বিশ্বস্ত এবং চুরি, ব্যভিচার, শারাবপান ইত্যাদি কাবিরাহ গুনাহ থেকে মুক্ত ব্যক্তি হতে হবে। বিবাহ-বন্ধনের শব্দ হলো, স্বামী, অথবা তার অভিভাবক বলবে, 'তোমার মেয়েকে অথবা যার সম্পর্কে তোমাকে অসীয়ত করা হয়েছে, তাকে আমার সাথে বিবাহ দিয়ে দাও' অতঃপর ওয়ালী বলবে, 'আমার মেয়েকে অথবা অমুককে আমার তত্ত্বাবধানে তোমার সাথে বিবাহ দিয়ে দিলাম'। অতঃপর স্বামী বলবে, 'আমার সাথে তার বিবাহকে গ্রহণ করলাম' স্বামী তার তরফ থেকে কাউকে উকীল নিযুক্ত করতে চাইলে, তা করতে পারে।

৪। মোহর প্রদান। আর মোহর কম হওয়াই হলো শরীয়তের বিধান। তাই মোহর যত কম হবে ও সাধ্যানুসারে হবে, ততই উত্তম। মোহরকে সেদাক্বও বলা হয়। বিবাহের সময় মোহরের উল্লেখ করা এবং তখনই

তা আদায় করে দেওয়া সুন্নাত। অনুরূপ সম্পূর্ণ মোহর পরে আদায় করা বা কিছু অংশ পরে আদায় করা ইত্যাদিতেও কোন দোষ নাই। যদি স্বামী স্ত্রীকে তার সাথে যৌনবাসনায় লিপ্ত হওয়ার পূর্বে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে স্ত্রী অর্ধেক মহরের অধিকারিণী হবে। কিন্তু যদি যৌনবাসনায় লিপ্ত হওয়ার পূর্বে স্বামী মৃত্যু বরণ করে, তাহলে সম্পূর্ণ মোহর ও মিরাস উভয়েরই সে মালিক হবে।

বিবাহের পর যা আরোপিত হয়

১। **ব্যয়ভার।** সঠিক প্রচলিত পন্থায় স্ত্রীর খাওয়া-পরা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা স্বামীর উপর ওয়াজিব। যদি সে এসব আদায়ে কৃপণতা করে, তাহলে সে গুনাহগার বিবেচিত হবে। আর এমতাবস্থায় স্ত্রী তার মাল থেকে প্রয়োজনানুযায়ী অর্থ নিতে পারবে। অথবা কারো নিকট থেকে ঋণ নেবে, যা স্বামী পরিশোধ করবে। ওলীমাহ করাও ব্যয়ভারের অন্তর্ভুক্ত। আর ওলীমাহ হলো, বিবাহের দিনে স্বামী কর্তৃক আয়োজিত খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা, যাতে লোকদের আমন্ত্রণ করা হয়। এটা একটি এমন নির্দেশিত সুন্নাত, যা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) নিজে করেছেন এবং করতে নির্দেশও দিয়েছেন।

২। **উত্তরাধিকার।** যখনই কোন পুরুষ কোন মহিলাকে সঠিক পন্থায় বিবাহ করবে, তখনই তাদের উভয়ের মধ্যে ওয়ারেসীস্বত্ব স্থাপিত হয়ে যাবে। এর প্রমাণ আল্লাহতা'য়ালার বাণী। তিনি বলেন,

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ

لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (النساء:١٢)

অর্থাৎ, "আর তোমাদের স্ত্রীগণ যা কিছু রেখে গেছে, তার অর্ধেক তোমরা পাবে, যদি তারা নিঃসন্তান হয়। আর সন্তানশীলা হলে, রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ তোমরা পাবে তখন যখন তাদের কৃত অসীয়ত পূরণ করা হবে এবং যে ঋণ অনাদায় রেখে গেছে, তা আদায় করা হবে। আর তারা তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক চতুর্থাংশের অধিকারিণী হবে, যদি তোমরা নিঃসন্তান হও। আর তোমাদের সন্তান থাকলে তারা পাবে আটভাগের একভাগ। এটাও তখনই কার্যকরী হবে, যখন তোমাদের অসীয়ত পূরণ করা হবে, আর যে ঋণ রেখে গেছো, তা আদায় করা হবে।" (৪ঃ ১২) এ ব্যাপারে স্বামী স্ত্রীর সাথে যৌনবাসনায় লিপ্ত হোক বা না হোক, তাকে নিয়ে নির্জনে থেকে থাকুক বা না থেকে থাকুক, তাতে কোন কিছু এসে যায় না।

বিবাহের সুন্নাত ও আদব

১। বিবাহের ঘোষণা ও প্রচার করা। অনুরূপ স্বামী-স্ত্রীর জন্য দুআ করা সুন্নাত। সুতরাং তাদের উভয়ের জন্য এই দুআটি করবে,

((بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ))

(বারাকাল্লাহু লাকা অবারাকা আলায়কা, অজামাআ' বায়নাকুমা ফি খায়রিন) অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় বরকতে ধন্য করুন এবং তোমাদের উভয়কে মঙ্গলের সাথে প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

২। যৌনবাসনায় লিপ্ত হওয়ার পূর্বে নিম্নের দুআটি পড়া সুন্নাত।

((بِسْمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا))

(বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিব নাশ্‌শায়ত্বানা অজান্নিবিশ্‌শায়ত্বানা মা রাযাক্ব তানা) অর্থাৎ, আল্লাহর নাম নিয়ে আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচাও এবং আমাদেরকে যে সম্পদ দান করবে তাকেও শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচাও।

৩। স্বামী-স্ত্রীর মিলনের গোপন রহস্য প্রকাশ করা উভয়ের জন্য হারাম।

৪। ঋতু ও নিফাস অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হারাম, যতক্ষণ না সে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করে নেয়।

৫। নারীর পায়খানার দ্বার যৌনসঙ্গমের সময় ব্যবহার করা স্বামীর উপর হারাম। কারণ, এটা এমন কবিরাহ গুনাহ, যা ইসলাম হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছে।

৬। সহবাসে স্ত্রীকে সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত করা স্বামীর উপর ওয়াজিব। অনুরূপ তার অনুমতি ও প্রয়োজন ব্যতীত গর্ভধারণের আশঙ্কায় আযল (যোনি পথের বহির্দেশে বীর্য পাত করা) করতে পারবে না।

কোন নারীকে বিয়ে করা উচিত?

বিবাহের উদ্দেশ্য হলো, স্বাদ গ্রহণ সহ সুন্দর পরিবার ও সুষ্ঠ সমাজ গঠন। তাই যদি এমন নারীকে অর্জন করা সম্ভব হয় যে নারী বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় সৌন্দর্যে ও গুণে গুণান্বিতা-বাহ্যিক সৌন্দর্য বলতে জন্মগত পরিপূর্ণতাকে বুঝানো হয়েছে, আর অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য বলতে দ্বীন ও চরিত্র উভয়ের পরিপূর্ণতাকে বুঝানো হয়েছে-সে বহু কল্যাণ লাভকারী বিবেচিত হবে এবং আল্লাহর তৌফীকে এটাই হবে পূর্ণতা ও সফলতা। তবে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো দ্বীনদার নারীকে প্রাধান দেওয়া।

কারণ, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এ ব্যাপারে ওসীয়ত করেছেন। নারীদেরও কর্তব্য হলো, সৎ ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিকে বিবাহ করতে আগ্রহী হওয়া।

যে সমস্ত নারীদের বিবাহ করা হারাম

যে সমস্ত নারীদের বিবাহ করা হারাম, তারা দুই প্রকার। এক, চিরকালের জন্য যাদের সাথে বিবাহ হারাম। দুই, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যাদের সাথে বিবাহ হারাম। প্রথমতঃ চিরকালের জন্য যাদের সাথে বিবাহ হারাম তারা তিন প্রকারেরঃ

১। বংশীয় সম্পর্কের কারণে যাদের সাথে বিবাহ চলে না। আর এরা সাত প্রকারের নারী, যার উল্লেখ মহান আল্লাহ কুরআনে করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾

[النساء ٢٣]

অর্থাৎ, "তোমাদের উপর হারাম করে দেওয়া হয়েছে, তোমাদের মা, তোমাদের মেয়ে, ভগ্নি, ফুফু, খালা, ভাইঝি, ভাগ্নী এবং তোমাদের সেই সব মা, যারা তোমাদের দুধ পান করিয়েছে। আর তোমাদের দুধ

বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মা, তোমাদের স্ত্রীদের মেয়েরা যারা তোমাদের কোলে লালিতা-পালিতা হয়েছে। আর সেই সব স্ত্রীদের মেয়েরা, যাদের সাথে তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু যদি (কেবল বিবাহ হয়ে থাকে আর) স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত না হয়ে থাকে, তাহলে (তাদের পরিবর্তে মেয়েদের সাথে বিবাহ করায়) তোমাদের কোন দোষ হবে না। আর তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীগণ এবং একই সংগে দুই বোনকে বিবাহ করা তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে, কিন্তু পূর্বে যা হয়েছে তাতো হয়ে গেছে। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। (৪ঃ ২৩)

(ক) মা বলতে এখানে মা, দাদী-নানী উভয়েই শামিল।

(খ) মেয়ে বলতে আপন মেয়ে, ছেলের মেয়ে ও মেয়ের মেয়ে সকলেই মেয়ের অন্তর্ভুক্ত।

(গ) বোন বলতে আপন বোন, বৈপিত্রেয়ী বোন ও বৈমাত্রেয়ী বোন সকলেই বোনের আওতায় আসে।

(ঘ) ফুফ বলতে আপন ফুফু, বাপের ফুফু, দাদার ফুফু, মায়ের ফুফু ও দাদী-নানীর ফুফু সকলেই ফুফুর অন্তর্ভুক্ত।

(ঙ) খালা বলতে আপন খালা, বাপের খালা, দাদার খালা, মায়ের খালা ও দাদী-নানীর খালা সকলেই খালার আওতায় পড়ে।

(চ) ভায়ের মেয়ে বলতে আপন ভায়ের মেয়ে, বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয় ভায়ের মেয়ে এবং এদের ছেলে ও মেয়েদের মেয়ে এইভাবে যতই নিচে যাওয়া যাবে।

(ছ) বোনের মেয়ে বলতে আপন বোনের মেয়ে, বৈপিত্রেয়ী ও বৈমাত্রেয়ী বোনের মেয়ে এবং এদের ছেলে ও মেয়েদের মেয়ে ও এইভাবে যতই নীচে

যাওয়া যাবে।

২। দুধ সম্পর্কের কারণে যে সমস্ত মহিলাদের সাথে বিবাহ করা হারাম।

এরা বংশীয় সম্পর্কের কারণে হারাম কৃতা নারীদের মতই। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)) متفق عليه ١٤٤٧-٢٦٤٥

অর্থাৎ, "দুধ পানেও ঐরূপ হারাম হয়ে যায়, যেরূপ বংশীয় সম্পর্কের কারণে হারাম হয়ে যায়"। (বুখারী ১৪৪৭-মুসলিম ২৬৪৫) তবে দুধ পানে হারাম হওয়ার কিছু শর্ত রয়েছে। যেমন,

(ক) কমপক্ষে পাঁচবার অথবা পাঁচাধিকবার দুধ পান করতে হবে। তাই যদি কোন শিশু চারবার দুধ পান করে, তাহলে দুধদানকারিণী মহিলা শিশুর মা বলে গণ্য হবে না।

(খ) এই দুধ পান দুধ ছাড়ার পূর্বেই [illegible]ত হবে। অর্থাৎ, পাঁচবার দুধ পান করা, দুধ ছাড়া সময়ের পূর্বেই হ[illegible] হবে। সুতরাং যদি দুধ পান দুধ ছাড়া সময়ের পরে হয় কিংবা কিছু আগে ও কিছু পরে হয়, তাহলে এই দুগ্ধদাত্রী মহিলা শিশুর মা বলে গণ্য হবে না।

দুধ পানের শর্তাবলী পরিপূর্ণ হলে, শিশু দুধদানকারিণীর ছেলে বলে পরিগণিত হবে এবং মহিলার ছেলে-মেয়েরা তার (দুধ) ভাই-বোন বলে গণ্য হবে। তাতে তারা এর আগের হোক কিংবা পরের হোক। মহিলার স্বামীর ছেলে-মেয়েরাও তার ভাই-বোন বলে গণ্য হবে। তাতে তারা ঐ মহিলারই হোক, যার সে দুধ পান করেছে, কিংবা অন্য মহিলার হোক। এখানে একটি জিনিস জেনে রাখা অত্যাবশ্যক যে, দুধ পানকারী শিশুর সন্তানাদি ব্যতীত তার আত্মীয় স্বজনদের সাথে দুধ পানের কোন সম্পর্ক

নেই। দুধ পান তাদের উপর কোন প্রভাব সৃষ্টি করবে না।

৩। বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে যে সমস্ত মহিলাদেরকে বিবাহ করা হারাম, তা হলো নিম্নরূপ,

(ক) **পিতা ও দাদাদের স্ত্রীগণ,** যখনই কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করবে, তখনই সেই মহিলা তার ছেলে, ছেলের ছেলে এবং মেয়ের ছেলের উপর হারাম হয়ে যাবে। তাতে সে তার সাথে সহবাস করুক, বা না করুক।

(খ) **ছেলেদের স্ত্রীগণ,** যখনই কোন ব্যক্তি কোন নারীকে বিবাহ করবে, তখনই সেই নারী তার পিতা ও দাদা-নানাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে। তাতে সে যৌনবাসনায় লিপ্ত হোক, বা না হোক।

(গ) **স্ত্রীর মা ও দাদী-নানী,** যখনই কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করবে, তখনই মহিলার মা ও দাদী-নানী তার উপর হারাম হয়ে যাবে। কেবল বিয়ে হলেই হবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হোক বা না হোক।

(ঘ) **স্ত্রীর মেয়েরা এবং স্ত্রীর ছেলের ও মেয়ের মেয়েরা,** যখনই কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করবে এবং তাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কও স্থাপিত হবে, তখনই মহিলার মেয়েরা ও ছেলের ও মেয়ের মেয়েরা তার উপর হারাম হয়ে যাবে। তাতে এই মেয়েরা আগের স্বামীর হোক কিংবা পরের স্বামীর হোক। তবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পূর্বেই যদি তারা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে স্ত্রীর মেয়েরা স্বামীর জন্য হারাম হবে না।

নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যাদের সাথে বিবাহ হারাম, তারাও কয়েক প্রকারের। যেমন,

১। স্ত্রীর বোন, ফুফু ও খালা যতক্ষণ না মৃত্যু অথবা তালাকের কারণে

স্ত্রী স্বামীর থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং তার ইদ্দতও শেষ হয়ে যাবে।
২। অন্যের ইদ্দত পালনকারিণী, অর্থাৎ, যখন কোন নারী অন্য স্বামীর ইদ্দত পালন করবে, তখন তার ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে বিবাহ করা বৈধ হবে না। অনুরূপ ইদ্দত পালন করাকালীন তাকে বিয়ের পায়গাম দেওয়াও বৈধ হবে না।
৩। হজ্জ অথবা উমরার নিয়তকারিণী, যতক্ষণ না সে হজ্জ অথবা উমরাহ থেকে সম্পূর্ণভাবে হালাল হবে, ততক্ষণ তার সাথে বিবাহ করা বৈধ হবে না।

তালাক

প্রকৃত পক্ষে তালাক একটি অপছন্দনীয় বস্তু। কিন্তু যেহেতু কখনো কখনো স্বামীর সাথে স্ত্রীর অবস্থান অথবা স্ত্রীর সাথে স্বামীর অবস্থান খুবই পীড়াদায়ক হয়ে যাওয়ার কারণে বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে তালাক দেওয়া অতি প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তাই আল্লাহ রহমত স্বরূপ তা বান্দা-দের জন্য হালাল করে দিয়েছেন। কাজেই উল্লিখিত (সমস্যার) কোন কিছু দেখা দিলে, স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারবে। তবে তালাক দেওয়ার সময় তাকে নিম্নে বর্ণিত বিধানের খেয়াল রাখতে হবে।
১। ঋতু অবস্থায় তাকে তালাক দেবে না। যদি ঋতু অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে সে একজন হারাম কাজ সম্পাদনকারী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফারমান বিবেচিত হবে। আর এমতাবস্থায় তালাক প্রত্যাহার করে নেওয়া এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তালাক না দেওয়া তার উপর ওয়াজিব হবে। অতঃপর পবিত্র হয়ে গেলে, সে ইচ্ছা করলে তাকে তালাক দিতে পারবে। তবে উত্তম হলো, দ্বিতীয় হায়েয পর্যন্ত তালাক না দেওয়া। দ্বিতীয় হায়েয থেকে পবিত্র হয়ে গেলে, ইচ্ছা

করলে তাকে তালাক দিতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে রাখতেও পারে।
২। এমন তহুরে (পবিত্রাবস্থায়) তালাক দিবে না, যে তহুরে সে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে, যতক্ষণ না তার গর্ভ প্রকাশ হয়ে যায়। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে মাসিকের পর সহবাস করে থাকে, তাহলে পুনরায় মাসিক হয়ে তা থেকে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাকে তালাক দিতে পারবে না, যদিও এ সময় সুদীর্ঘ হয়। অতঃপর ইচ্ছা করলে তাকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিতে পারবে। তবে যদি তার গর্ভ প্রকাশ হয়ে যায় অথবা সে যদি অন্তঃসত্ত্বা থেকে থাকে, তাহলে তালাক দেওয়াতে কোন দোষ নেই।

তালাকের পর যা আরোপিত হয়

যেহেতু তালাকের অর্থই হলো, স্ত্রীর স্বামীর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। তাই এই বিচ্ছেদের উপর কিছু বিধান আরোপিত হয়। যেমন,
১। যদি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে থাকে অথবা স্বামী স্ত্রীর সাথে নির্জনে থেকে থাকে, তাহলে ইদ্দত পালন করা স্ত্রীর উপর ওয়াজিব হবে। তবে যদি স্বামী যৌনবাসনায় লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই তাকে তালাক দিয়ে দেয় এবং তার সাথে নির্জনে না থেকে থাকে, তাহলে তাকে কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না। আর ইদ্দত হলো, তিন ঋতু, যদি ঋতুমতী হয়। আর যদি ঋতুমতী না হয়, তাহলে তিন মাস। আর গর্ভবতী হলে, প্রসবকাল পর্যন্ত। আর এই ইদ্দতের উদ্দেশ্য হলো, স্বামীকে তার স্ত্রী প্রত্যাহার করে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া। অনুরূপ মহিলা গর্ভবতী কি না, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া।
২। স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে যদি এই তালাকের পূর্বে দুইবার তালাক দিয়ে থাকে। অর্থাৎ, স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দেওয়া পর রুজু'

করে থাকে অথবা ইদ্দত শেষ হওয়ার পর বিবাহ ক'রে দ্বিতীয় তালাক দিয়ে ইদ্দতের মধ্যেই আবার রুজু' করে থাকে কিংবা ইদ্দতের পর বিবাহ করে থাকে, তারপর আবার তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে যতক্ষণ না স্ত্রী অন্য কারো সাথে সঠিক পন্থায় বিবাহ করবে এবং তাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হবে, ততক্ষণ তার জন্য এই স্ত্রী হালাল হবে না। অতঃপর যদি সে (দ্বিতীয় স্বামী) তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে সে প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ হবে। নারীদের প্রতি রহম করে এবং স্বামীদের অত্যাচার থেকে তাদেরকে নিষ্কৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ পাক তিন তালাকদাতার উপর তার স্ত্রীকে হারাম করে দিয়েছেন।

খুলআ'

খুলআ' হলো, মালের বিনিময়ে সেই স্বামীর নিকট থেকে স্ত্রীর তালাক চাওয়া, যাকে সে ঘৃণা করে। তবে স্বামীই যদি স্ত্রীকে ঘৃণা করে তার থেকে তাকে দূর করতে চায়, তাহলে স্ত্রীর নিকট থেকে কোন কিছু নেওয়া তার জন্য বৈধ হবে না। বরং তার কর্তব্য হবে, হয় সে ধৈর্য ধরবে, না হয় তালাক দিবে। আর স্ত্রীর উচিত স্বামীর সাথে তার থাকা একান্তই পীড়াদায়ক ও অসহ্যকর না হলে, খুলআ' না চাওয়া। অনুরূপ ইচ্ছাকৃত-ভাবে স্ত্রীকে খুলআ' চাওয়াতে বাধ্য করার জন্য কষ্ট দেওয়া স্বামীর জন্য বৈধ নয়। আর মোহরের অধিক স্ত্রীর কাছ থেকে নেওয়া অপছন্দনীয়।

বিবাহে একে অপরের অধিকার

কোন কারণবশতঃ বিবাহ বন্ধনকে প্রতিষ্ঠিত রাখার অথবা তা বানচাল করার অধিকার স্বামী-স্ত্রীর রয়েছে। যেমন, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অথবা স্ত্রী স্বামীর মধ্যে এমন রোগ বা জন্মগত দোষ পেলো, যা উভয়কে আক্বদের

সময় জ্ঞাত করানো হয়নি। এমতাবস্থায় তাদের উভয়ের এ বিবাহ বন্ধনকে প্রতিষ্ঠিত রাখা ও না রাখার অধিকার রয়েছে। যেমন মনে করুন,

১। তাদের উভয়ের মধ্যে কেউ পাগল অথবা এমন রোগাক্রান্ত, যা অপরকে বিবাহের সম্পূর্ণ অধিকার পূরণে অন্তরায় সৃষ্টি করে, এমতাবস্থায় অপরজনের এ বিবাহকে বানচাল করার অধিকার থাকে। আর যদি এটা সঙ্গমের পূর্বে হয়, তাহলে স্বামী স্ত্রীকে দেওয়া মোহর ফিরত নিবে।

২। যদি সাথে সাথে মোহর দিতে অক্ষম হয়, তাহলে স্ত্রী যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে বিবাহকে বানচাল করতে পারে। কিন্তু সহবাসের পর হলে, তা পারবে না।

৩। ব্যয়ভার বহনে অক্ষম হওয়া। যদি স্বামী ব্যয়ভার বহনে অক্ষম হয়, তাহলে স্ত্রী সাধ্যানুসারে কিছু দিন অপেক্ষা করার পর কাজীর মাধ্যমে এ বিবাহ বানচাল করতে পারবে।

৪। যদি স্বামী অদৃশ্য হয়ে যায়, সে কোথায় আছে তা যদি কাউকে না জানায়, স্ত্রীর খরচের জন্য যদি কিছু রেখে না যায় বা কাউকে এ ব্যাপারে অসিয়ত না করে যায়, কেউ যদি তার ব্যয়ভার গ্রহণ না করে এবং তার নিকট ব্যয় করার মত যদি কিছু না থাকে, তাহলে সে শরীয়তের কাজীর মাধ্যমে এ বিবাহ বানচাল করতে পারবে।

অমুসলিমকে বিবাহ করা

ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান ব্যতীত অন্য কোন অমুসলিম নারীকে বিবাহ করা মুসলমানদের জন্য হারাম। আর ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান সহ কোন অমুসলিমকে **বিবাহ করা মুসলিম নারীর জন্য বৈধ নয়। অনুরূপ যদি কোন নারী স্বামীর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তাহলে যতক্ষণ না স্বামী** ইসলাম গ্রহণ করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীর জন্য জায়েয হবে না যে, সে

নিজেকে স্বামীর জন্য পেশ করবে। নিম্নে অমুসলিমদের সাথে বিবাহ করার কতিপয় বিধান পেশ করা হলো,

১। যদি কাফের স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তাহলে তারা কোন শরীয়তী নিষেধ ব্যতীত তাদের বিবাহে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। শরীয়তী নিষেধ বলতে যেমন, নারী যদি স্বামীর জন্য হারাম হয় অথবা তাকে বিবাহ করা যদি হালাল না হয়, তাহলে তাদের উভয়কে একে অপর থেকে পৃথক করে দেওয়া হবে।

২। যদি কোন ইয়াহুদী বা খ্রীষ্টান নারীর স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তাহলে তারা তাদের বিবাহে প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

৩। ইয়াহুদী বা খ্রীষ্টান ব্যতীত স্বামী-স্ত্রীর কেউ যদি সঙ্গমের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তাহলে নিকাহ বাতিল গণ্য হবে।

৪। যদি ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান বা অন্য কোন অমুসলিম স্বামীর স্ত্রী সহবাসের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তাহলে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে, কেননা, কোন মুসলিম নারী কাফেরের জন্য বৈধ নয়।

৫। যদি কোন কাফেরের স্ত্রী সঙ্গমের পর ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিষয় স্থগিত থাকবে। অতঃপর ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে এবং স্বামী ইসলাম কবুল না করলে, তা বাতিল গণ্য হবে। এরপর স্ত্রী চাইলে বিবাহ করতেও পারে, আবার স্বামীর জন্য অপেক্ষা করতেও পারে। আর এই সময়ের মধ্যে স্ত্রীর স্বামীর উপর কোন অধিকার থাকবে না। অনুরূপ স্ত্রীর উপর স্বামীরও কোন আধিপত্য থাকবে না। যদি স্বামী ইসলাম কবুল করে নেয়, তাহলে আগের স্ত্রী স্ত্রীই থাকবে নতুনভাবে বিবাহ করার প্রয়োজন হবে না, যদিও অপেক্ষার সময় সুদীর্ঘ হয়ে যায়। ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান ব্যতীত অন্য অমুসলিম নারীর স্বামী ইসলাম

কবুল করলে, তার বিধানও অনুরূপ।

৬। যদি যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই স্ত্রী মুর্তাদ (ধর্ম বিমুখ) হয়ে যায়, তাহলে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে এবং সে মোহরও পাবে না। তবে যদি স্বামীই মুর্তাদ হয়ে যায়, তাহলে বিবাহ বানচাল হয়ে যাওয়া সহ অর্ধেক মোহরও দিতে হবে। তাদের মধ্যে যে মুর্তাদ হয়েছিল, সে যদি পুনরায় ইসলাম স্বীকার করে নেয়, তাহলে তারা প্রথম বিবাহের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যদি তাদের মধ্যে কোন তালাক সংঘটিত না হয়ে থাকে।

ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান নারীদেরকে বিবাহ করার ক্ষতি

আল্লাহ তা'য়ালার বিবাহ ব্যবস্থাকে বৈধ করার মধ্যে উদ্দেশ্য হলো, চরিত্রের পরিশুদ্ধি করণ, সমাজকে অশ্লীলতা থেকে পবিত্র করণ, লজ্জা-স্থানের সংরক্ষণ এবং সমাজের জন্য একটি সুষ্ঠু ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সংস্থাপন সহ এমন মুসলিম উম্মার গঠন, যার মুখ থেকে উচ্চারিত হবে-لا إله إلا الله محمد رسول الله 'আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকার উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁর প্রেরিত রাসূল'। সুতরাং কোন নেক, ধার্মিকা, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্না ও চরিত্রবান মহিলাকে বিবাহ করা ব্যতীত উক্ত উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের মেয়েকে বিয়ে করার কতিপয় কুপ্রভাবের কথা নিম্নে উল্লেখ করা হলো,

১। **পরিবারে তার প্রভাব।** ছোট পরিবারে স্বামী যদি ব্যক্তিগতভাবে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হয়, তাহলে তার প্রভাবে স্ত্রীর প্রভাবিতা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ও বড় আশা থাকে যে, সে ইসলাম কবুলে ধন্য হয়ে যাবে। আবার এর বিপরীতও হতে পারে। কারণ কখনো স্ত্রী অন্য

ধর্মকে আকঁড়ে ধরে থাকে এবং ঐ সমস্ত জিনিস সে পালন করে, যে ব্যাপারে সে মনে করে যে, তার ধর্ম এগুলোকে বৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছে। যেমন, শারাব পান ও শূকরের মাংস ভক্ষণ করা এবং গোপনে প্রেম করা ইত্যাদি। আর এইভাবে একটি মুসলিম পরিবার ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়ে। সে পরিবারের ছেলেরা নৈতিক শৈথিল্যের উপর গড়ে উঠে। আবার কখনো সমস্যা আরো জঘন্য পরিস্থিতির শিকার হয়, যখন এই অন্ধভক্তা বা নাফারমান স্ত্রী আপন সন্তানদেরকে সাথে করে গীর্জায় নিয়ে গিয়ে খ্রীষ্টানদের নামায দেখায় এবং তাদের মধ্যে এর বিশ্বাস সৃষ্টি হয়। কথায় বলে, যে ব্যক্তি যে জিনিসের উপর লালিত-পালিত হয়, সে সেই জিনিসের স্বভাবে স্বভাবসিদ্ধ হয়।

২। **সমাজে তার প্রভাব।** মুসলিম সমাজে ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান নারীদের আধিক্য খুবই ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক ব্যাপার। কারণ, এই নারীরা মুসলিম উম্মার চিন্তাধারার উপর বিপজ্জনক আক্রমণ চালাতে ও পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে এবং খ্রীষ্টীয় কার্য-কলাপ ও জঘন্য স্বভাব প্রচারের জন্য দূতের কাজ করে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, নারী-পুরুষের নগ্নতার সাথে অবাধ মিলামিশার অভ্যাস সহ অন্য আরো ইসলামী শিক্ষা বিরোধী প্রচেষ্টা।